সীমান্ত কথা-৫

মখদুম আজম মাশরাফী

বাংলার উত্তরাঞ্চলের মানুষ বলেই বুঝি উভয় বাংলার উত্তরপ্রান্ত আমাদের কাছে ছিল একাকার। রাজনৈতিক সীমান্তরেখার অদৃশ্য দেয়াল আর পতাকার ভিন্ন রং দীর্ঘদিনেও পারেনি আমাদের পৃথক করতে একে অন্যের থেকে। তাই পারিবারিক সংযোগ আর অভিযাত্রিক অভিলাষ বার বার টেনে নিয়ে গেছে আমাদের একের কাছে অন্যের। মেডিকেলের সহপাঠি পুরুষোত্তম আর আমি বেশ ক'বার ভ্রমন যাত্রা করেছি ওপারের রহস্যভরা প্রান্তরে। তেমনি আমরা একবার চলেছি বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে কলকাতার পথে। ট্রেনে রংপুর থেকে আমরা যখন পৌছালাম যশোহর তখন দুপুর। চেকপোষ্টে যেতে হলো ভিসা পাসপোর্ট দেখাতে। এপারের বি.ডি.আর আর কাষ্টমস আর ওপারের বি,এস,এফ আর কাষ্টমস কাগজপত্রাদি চেক সারলে পৌছালাম অস্থায়ী একটি ছোট্ট বাজার মত জায়গায়। সারিবাঁধা বেশ কিছু টিনচালা আর বেড়া ঘেরা চা নাস্তার দোকান। পান বিড়ির দোকান। ছোট্ট খাবার হোটেল ইত্যাদি। রাস্তার ধারে দাঁড়ানো বেশ কিছু সাইকেল রিক্সার সারি- যাত্রির প্রতীক্ষায়। বাংলাদেশ থেকে যাত্রি দেখে দোকান ওয়ালা, রিক্সাওয়ালারা ডাকাডাকি শুরু করে তাদের গ্রাহক, যাত্রী হতে। ক্রমে ওরা কাছে এসে ব্যাগ পেটরা ধরে টেনে নিয়ে যেতে চায়। রীতিমত আক্রান্ত হওয়ার মত। কিছুটা বিরক্তিকর- বেশীটাই শংকার। পুরুষোত্তমের কণ্ঠ ছিল বেশ ভারী। ও সাহসীও ছিল বেশ। ধৈর্য্যচ্যুতি হলে পুরুষোত্তম ওদের বিরত করতে চেষ্টা করলে ওরা সবাই একযোগে রাগান্বিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ একদল তরুন চায়ের দোকান থেকে উঠে দাঁড়ায়। ধমকের সুরে বলে," ও মিঞা ওঠো রিক্সায়। ব্যাটা মুসলমান, এখানে দেমাগ দেখাতে এসেছো।" ওরা রেগে রক্তচক্ষু করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আমি পুরুষোত্তমকে সামলে তাড়াতাড়ি একটা রিক্সায় উঠে বসি। রিক্সা আমাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে ভারতীয় রেলস্টেশনের দিকে- কাঁচা রাস্তা ধরে। স্টেশন সেই জায়গা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দুরত্বে। আমি হাফ ছেড়ে বাঁচি। ঐ তরুন মস্তানরা আর রিক্সাওয়ালারা সংঘবদ্ধ। বাংলাদেশের যাত্রীদের অথবা ভারত থেকে বাংলাদেশগামী যাত্রী উভয়দলকে এরা এভাবে শাঁসিয়ে থাকে। এ সীমান্তবর্ত্তী এলাকা এদেরই রাজত্ব। এদের বিপরীতে কথা বা কাজ রীতিমত বিপজ্জনক। এ যাত্রায় বেঁচে যাই কোন মতে। পুরুষোত্তম তখনও রাগে বাঘের মত গর গর করে চলেছে। কিন্তু আমি তো ভাল ভাবে জানি, এ বিপদ আমার যতটা ততটা বোধ করি ওর জন্যে নয়। যদিও মস্তানরা ভেবে নিয়েছে আমরা দু'জনেই মুসলমান। তবে মস্তানদের স্বার্থের প্রশ্নে আমরা কে মুসলমান আর কে নয়- তাতে কোন পার্থক্য হবে না নিশ্চই ।

ভারতীয় রেল স্টেশনে পৌঁছে মিশে যাই সাধারণ যাত্রীদের সাথে। তাতে কিছুটা নিরাপদ বোধ করি। কিন্তু মুখ রাখি যথাসম্ভব বন্ধ। কারন আমাদের কথায় খুব সহজেই বোঝা যায় আমরা কলকাতাভাষী নই। তাতেও বিপত্তির আশংকা। যেন ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে বড় ভয়। এ স্টেশন থেকে কলকাতার শিয়ালদহ এর ছয় সাত স্টেশন পরেই। আমাদের কিছু টাকা বদলাতে

হলো ট্রেনের টিকিট আর প্রাথমিক প্রয়োজনের জন্যে। সেও করতে হল খুব সতর্কতার সাথে। তারপর চেপে বসলাম ট্রেনে। বাংলাদেশের মতই মলিন, ভীড়পূর্ণ ট্রেনে অতি সাধারন অসংখ্য যাত্রী। ট্রেনে পান-বিড়ি-সিগারেট, চা-বিস্কিট-কেক, ঝালমুড়ি, চিনাবাদাম, খুব বিক্রি চলছে। ফেরিওয়ালারা সুর করে হাঁকছে পণ্যের নাম। 'আই চা.... আই কফি..... কফি... আয় চিনাবাদাম... আই গরম চা....।'

ভ্রমন-অভিযাত্রী মনের আনন্দ আর সীমান্তে মস্তানদের হুমকি একটি মিশ্র অনুভুতিতে সজাগ রাখলো সারাটা পথ। বাংলাভাষা-ভাষী আরেক জগতের ছোট বড় নানান ভিন্নতা সহজেই চোখে পড়লো একের পর অন্যটির। কখনও তা আনন্দিত করলো, কখনও শংকিত, কখনও বা বিমর্ষ। পদে পদে অচেনার মুখোমুখি হওয়ার যে উত্তেজনা তা কে সততঃই মিইয়ে দিচ্ছিল সেই অজানা ভীতি।

শিয়ালদা এক বিরাট বিশাল রেল স্টেশন। এর বিরাটত্ব শুধু লোহা লক্কড় আর ইট পাথরে নয়, এক বিপুল সংখ্যক যাত্রীর সদা ব্যস্ত আশা যাওয়া প্রানবন্ত করে রাখে এই বিপুল আয়োজন। এ স্টেশনের দিন রাত্রি বলে কিছুই নেই। একই সাথে আসছে প্রায় ২০ টার মত ট্রেন। ছেড়ে যাচ্ছে সমান সংখ্যক। বিশাল প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিচালনায় এটি একটি সফল উপমা। বিপুল সংখ্যক যাত্রীর মধ্যে নিজেদের বেশ হারানো মনে হল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্রামে উঠে বসলাম। তখন কলকাতার পাতাল রেলের কাজ শুধু শুরু হয়েছে ১৯৮১ সালের দিকে। ট্রামই প্রধান বাহন।

ধর্মতলার কাছে একটি তিনতলা ভবনের ওপরে একটা ছোট্ট ইউনিটে থাকেন পুরুষোত্তমের এক আত্মীয় পরিবার। জরাজীর্ণ সুবিশাল সুউচ্চ সে ইউনিটগুলির মাঝখানে লোহার পেচানো সিড়ি। সিড়ির চারদিকে ঘিরে বারান্দা। আর বিভিন্ন তলায় বারান্দাগুলির পেছনেই সেই ইউনিটগুলি । ঢাকার কোন ইমারতের সাথেই সেগুলোর তুলনা করতে পারলাম না বলে পুরো কল্পচিত্র আঁকা হলো না । সে ইউনিটের একটিতে মাত্র দুটি কামরা। একটি ঘরে বসার ও রান্নার জায়গা আধা আধি করে। অন্যটি একটি মাত্র শোবার ঘর। সে ঘরের মাঝখানে একটি পর্দা দিয়ে দু'ভাগ করা। একভাগে থাকেন দম্পতি, অন্য ভাগে ছেলেমেয়েরা থাকে গাদা গাদি করে। পানি আনতে হয় কুয়োতলার মত কলতলা থেকে। সে কলতলায় অবিরত জল ঝরছে। রাস্তার পাশেই চলছে পাবলিক স্নান নারী-পূরুষ-শিশু নির্বিশেষে। রাস্তার ওপারে বিশাল অংশ জুড়ে পড়ে আছে নানান দুর্গন্ধময় আবর্জনা। কলকাতা বেশীরভাগই খুবই নোংরা পৃথিবীর যেকোন শহরের তুলনায়। এর পরিকল্পনা আধুনিক শহরের ধারনা থেকে ৩৫০ বছর আগের। আর দরীদ্র-কর্মজীবি, কখনও ছিন্নমূল আর নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের রণক্ষেত্র এটি। এখানে ঝরে ঘাম, ঝরে অশ্রু, ঝরে রক্ত। কিন্তু তবুও কলকাতা এক প্রাণবন্ত নগরী। এর আছে দীর্ঘ, গভীর, প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস।

আমরা সেই ইউনিটে কাটিয়েছি ক'দিনের বেশ কিছুটা সময়। তাদের কঠোর জীবনের ছন্দে কিছুটা ভিন্নতা এনেছিলাম আমরা। পুরুষোত্তম আত্মীয় তাই, প্রচুর আন্তরিকতা ও আপ্যায়ন

মিলেছিল আমাদের ভাগ্যে। কলকাতার জীবন প্রত্যক্ষ করেছি নানান কৌনিক অবস্থান থেকে। এ যাত্রায় ছিল বেশ কিছু অভিজ্ঞতা। পুরুষোত্তমের সাথে কলকাতার কালি ঘাটে গিয়েছি, কালিমন্দির দর্শনে । ওখানে লাইনে দাঁড়াতে হয় প্রতীমা দর্শনের জন্যে। তার আগে কিনে নিতে হয়, কিছু বকুল ফুলের মালা অথবা হলুদ গাঁদার ফুল। সে ভক্তি নিবেদনের জন্যে সমেবত নরনারীদের উপস্থিতি ও অভিব্যক্তি উপভোগ করেছিলাম আমরা দু'জনে । প্রার্থনার জন্য মানুষের সমবেত হওয়ার মধ্যে দুটো রুপ আমার কাছে চোখে পড়ে। একটি নৈবদ্যের অন্যটি পূন্য লাভের অথবা পাপ অনুতাপের। কার মধ্যে কোনটি বেশী সক্রীয় তা বুঝা শক্ত। আমি মথুরা, বুধগয়া, মঈনুদ্দিন চিশতির মাজার থেকে শুরু করে কাবা শরীফ, মদীনার রসুলুল্লাহর রওজা সব খানেই একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি। ভক্তিতে, নৈবদ্যে, প্রার্থনায় মানুষের যে রুপ উন্মোচিত হয় তার একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে।

কালিঘাট মন্দিরে আমরা লাইনে দাঁড়ানো । একজন ধুতি ও শাদা লম্বা জামা পরা শীর্ণকায়, ম্লানমুখ তরুন কপালে চন্দনের তিলক আঁকা এসে দাঁড়ালো পাশে। বললো, "দাদা পুজো দেবেন ? আমি গরীব ব্রাম্মন ছেলে, আমাকে কিছু পয়সা দিন, আমি আপনার পুজো করিয়ে দেবো।" দেখে মায়া হলো। মনে হলো অনাহারী। কারন 'মায়ের' মন্দিরে সবাই নিজেই পুজো দিতে চায়। সবাই কম বেশী দরীদ্র। তাদের সামর্থ নেই ব্রাম্ধন নিয়োগ করে পুজো দিতে। ব্রাম্ধনও একালে "গরীব, দরীদ্র।" ভিক্ষের ভঙ্গিমায় এখনও তাই সেই উচ্চবর্ণের গৌরব ধারন করে থাকতে হচ্ছে গরীব এ জীবনে। পুরুষোত্তম আর আমি ঠিক করেছিলাম তাকেই দেয়া হোক পুজোর ভার। ব্রাম্ধনের অকল্যানে ভগবানের আশীর্বাদ হারানোর ভয়ে নয়। অপসৃয়মান কালের স্রোতকে কিছুক্ষন হলেও ঠেকিয়ে রাখতে।

মাখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া

লেখক পরিচিতি দেখতে উপরে লেখকের ছবিতে টোকা দিন